জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

সেলিম আল দীন প্রণীত *নিমজ্জন* : গঠনকাঠামো বিশ্লেষণ

মোঃ কামালউদ্দিন খান*

Abstract

Selim Al Deen stands out as a playwright in the contemporary Bangla theatre art scenario. Against the colonial history of Bangla plays, he has established a unique history in Bangla performing arts. At the same time, he has introduced a unique style in the structure of Bangla plays. In each of his works we come across a variety of experiments in terms of the modern construction of plays adhering to the traditional structures and style. His play *Chaka* (1991) which is written following the tradition *panchali* and *kathokata*, is the pioneer in the genre of *kathanattay*. This genre has achieved full maturity in *Nimajjan* (2003/4). Selim Al Deen has come up with numerous narrative theatres ignoring the traditional western play writing style. Instead, he has embraced a style that reflects and represents the wealth of the art and culture of the land he belongs to. In *Nimajjan* we witness the presence of *panchali* style and various aspects, language and terms of Bangla performing arts. At the same time, we come across a similarity between the Bible and the *Jataka*. Apart from these, Rabindranth Tagore and his philosophy has given the text a higher dimension. An offbeat work may not be recognized in contemporary age and time, but it earns recognition, reputation and establishment through the critical analysis and appreciation of the future audience. *Nimajjan* can be considered such a text.

দেশজ কিংবা নিজস্ব নাট্যরীতির আশ্রয়ে বা ধারাবাহিকতায় নাটকের আধুনিক গড়ন কী হতে পারে তারই নানা নিরীক্ষা-নির্দশন আমরা পেয়ে যাই সেলিম আল দীনের (১৯৪৯-২০০৮) এক একটি সৃজনকাণ্ডে। বাঙলা পাঁচালি ও কথকতার ধারায় রচিত *চাকা* (১৯৯১) পাঠরূপের মাধ্যমে কথানাট্য নাম আঙ্গিকের যে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট অভিযাত্রা শুরু হয়েছে, *নিমজ্জন* (২০০৩/২০০৪) পাঠরূপে তা এক উৎকর্ষময় পূর্ণতা পেয়েছে। নাটক রচনার প্রচলিত আঙ্গিক সম্পূর্ণ অমান্য করে কথা, গীতছন্দময় বাণী ও সংলাপের সমন্বয়ে আঙ্গিকপ্রাপ্ত কথানাট্য প্রকাশ বা প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গেই তা 'নতুন সাহিত্য মাধ্যম' বলে স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত হয় এইভাবে : 'কথানাট্য– যা নাটক, কবিতা, নাচ, গীত, উপন্যাস, উপকথা ও কথকতার সমাহর।'[১]

লক্ষণীয়, সেলিম আল দীনকৃত বিচিত্র সৃজনযজ্ঞে কথানাট্য ধারায় *চাকা* (১৯৯১), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯২), *হরগজ* (১৯৯২) এবং উপাখ্যান নাট্য ধারায় *বনপাংশুল* (১৯৯৭) ও *প্রাচ্য* (২০০০) রচনার পর *নিমজ্জন*-এ এসে রচয়িতা একে শেষতক কাব্য[২] নামে অভিহিত করেছেন। যদিও এই 'নিমজ্জন নাম কাব্য' পাঠরূপ বা টেক্সটের গভীরে প্রবেশ করতে থাকলে দেখা যাবে এর অঙ্গসংস্থানে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে বাঙলার গীতরঙ্গ তথা নিজস্ব নাট্যের চিহ্নসূত্রাদি। *নিমজ্জন* কথাপুচ্ছসহ প্রাসঙ্গিক নানা রচনায় এ সংক্রান্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। *নিমজ্জন* রচনায় পাঁচালি কথকতার পদপয়ারের ধাঁচ সক্রিয় থাকার কথা রচয়িতা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি এও লক্ষ্য করেছেন যে, বাঙলা পাঁচালি গড়নের এই ধরণ বাইবেল জাতক প্রভৃতি মহাগ্রন্থের সঙ্গে মিলে যায় এবং প্রাচীন সাকল্য মহাকাব্য একই নিয়মে গড়ে উঠেছে।[৩]

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

*নিমজ্জন*পূর্ব *বনপাংশুল* (১৯৯৭) পাঠরূপে নাট্যের পরিভাষারূপে পাঁচালির অঙ্গ-উপাদান পদ, বোলাম, কথা, দিশা, নাচাড়ি ও নাটগীত ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে। *প্রাচ্য* (১৯৯৮) পাঠে আরও যুক্ত হয়েছে 'শিকলি'। পাঁচালিতে বর্ণনা অর্থে 'শিকলি' পাওয়া যায়। শিকলি ও পদ সমার্থক।[৪]

পাঁচালি আঙ্গিকের এই পরিভাষাসমূহের মূল অর্থ নিম্নরূপ :

১. পদ– পয়ার।
২. বোলাম– চরিত্রের সংলাপ, একক কথন অথবা একক উক্তি।
৩. কথা– কাহিনী বা ঘটনার বিবরণ। চরিত্রের সংলাপ।
৪. দিশা– ধূয়া।
৫. নাচারি– ভাবভঙ্গি অর্থাৎ অভিনয় সংযুক্ত নৃত্য।

সেলিম আল দীন তাঁর উপাখ্যান (*বনপাংশুল*, *পাচ্য*) পাঠসমূহে উক্ত পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন ঈষৎ পরিবর্ধিত বা বিস্তারিত অর্থে:

১. আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে রচিত রাগশূন্য অথবা সরাগ।
২. বোলাম– পাত্রপাত্রীর সংলাপ।
৩. কথা– গদ্যে বর্ণনা ব্যাখ্যা। চরিত্রের সংলাপ। রাগভিত্তিক।
৪. দিশা– লৌকিক গানের সাধারণ ধুয়া।
৫. নাচারি– আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে রচিত। রাগভিত্তিক নৃত্য ও অভিনয় সহযোগে পরিবেশনীয়।[৫]

এছাড়া, বাঙলার গীতরঙ্গের বিচিত্র প্রকার আঙ্গিকের স্বতন্ত্র নামপরিভাষা থেকে বহু পরিভাষা গ্রহণ ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেলিম আল দীনকৃত নাট্য নিদর্শন বাঙলা নাট্যের স্বতন্ত্র অবয়ব ও অভিমুখ তৈরি করেছে। দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গীয় জনপদে চর্চিত গীতরঙ্গসমূহে কথা-গীত-নৃত্যবহুল পরিবেশনা নাটগীত বা গীতনাট নামে প্রচলিত ছিল।[৬] বনপাংশুল ও প্রাচ্য আখ্যান নাট্যের কাঠামো নির্মাণে পাঁচালির অঙ্গ-উপাদানের সঙ্গে 'নাটগীত'ও যুক্ত হয়েছে। অসমীয় লীলানাট্যের শেষ অংশে দেবতা ও সভাজন উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশস্তিবচনকে বলা হয় অন্তিম ভটিমা।[৭] এই 'অন্তিম ভটিমা' যুক্ত হতে দেখি উপাখ্যান নাট্য দুটির পাঠরূপের অন্তে। ঐতিহ্য অনুষঙ্গের এসব পরিভাষা ও বিষয়াবলিকে নগর নাট্য আয়তনে বারংবার নবতর গঠন কাঠামো ও শৈলীর মধ্য দিয়ে, সুনির্দিষ্ট প্রয়াসে, নিজস্ব নাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে/ অবলম্বনে আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যের ধারণা 'গৌড়জন'দের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

*নিমজ্জন*পূর্ব পাঠসমূহে, বিশেষ করে কথানাট্য রীতর পূর্বাপর প্রায় সকল পাঠরূপের অঙ্গসংস্থানে জড়িয়ে আছে বাঙলার গীতরঙ্গের নানা মাধ্যমের নানা পর্যায়ের গীতালু[৮]-গায়েন-পালাকার-কবি কথক সৃজিত হরেক পরিভাষাসহ নিজস্ব নাট্যের অনিবার্যতায় উদ্ভাবিত নাম-পরিভাষা বা শব্দসংকেত।

নিমজ্জন রচনা পর্যায়ে এসে রচয়িতার মননজুড়ে নিজস্ব নাট্যআঙ্গিক নির্মাণের ধারাবাহিক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা রূপকল্প এই পাঠরূপে এসে অন্য মাত্রা পেয়েছে। প্রাচীন যাবতীয় মহাকাব্য জনে জনে শ্রুতিতে শ্রুতিতে বাহিত হওয়ার মধ্যেই মহাআখ্যানের খণ্ড আখ্যান বা ঘটনার আলাদা

আলাদা শীর্ষনাম সহযোগে সংকলিত একালে এক একটি মহাগ্রন্থ পেয়েছি। মহাকাব্য সৃজনের এই ভঙ্গি ও প্রবণতা নিমজ্জন পাঠরূপের সর্বাঙ্গে সক্রিয় ছিল। এখানে পূর্বতন সর্গ-খণ্ড, লম্বক-তরঙ্গ, কিংবা পদ-বোলাম-কথা-দিশা-নাচাড়ি কোনোকিছু যুক্ত না হয়ে কেবল প্রতি ঘটনার শীর্ষে একটি শিরোনাম দিয়ে পদ রচনার মাধ্যমে সমগ্র আখ্যানকাণ্ড গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গেই রচয়িতা বাঙলা পাঁচালি কথকতার পদপয়ারের ধাঁচ এবং বাইবেল জাতক প্রভৃতির গড়ন রীতির প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৯] এমনকি *নিমজ্জন* রচনা কাঠামোতে ইংরেজি ভাষার যতিচিহ্ন চাকার মতোই পরিত্যক্ত হয়েছে। সেমিকোলন ও কমার স্থলে উনিশ শতকের জঙ্গনামা সহিদে কারবালা গাজীকালুচম্পাবতী প্রভৃতি পুথির চরণে ব্যবহৃত তারকাচিহ্ন যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য সংলাপপর্বে কোলন রাখা হয়েছে আবার বিস্ময় বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন 'পরিকল্পিতভাবেই' নিমজ্জন পাঠরূপে বর্জিত।[১০]

নিমজ্জন পাঠ বিশ্লেষণের বিস্তারে যাবার আগে, পাঠরূপটির আঙ্গিক কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবার লক্ষ্যে (কথাপুচ্ছে) উল্লেখিত পাঁচালি পুথি বাইবেলসহ সমকালীন সমধর্মী আঙ্গিকপ্রবণ পাঠ বা টেক্সট থেকে কিছু নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পাঁচালি আঙ্গিক সম্পর্কে সেলিম আল দীনকৃত *বাঙলা নাট্যকোষ* গ্রন্থে পাঁচালি শব্দের নানা অর্থপরিচয় ও এর অঙ্গ-উপাদানের বিভিন্নতা তুলে ধরা হয়েছে। একালেও আবহমান গীতরঙ্গ চর্চায় নানাবিধ আঙ্গিক-বিষয়ের পরিচয় ঘটলেও ঠিক পাঁচালি আঙ্গিকনামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে না। যদিও গ্রামীণ গার্হস্থ্য জীবনে গৃহ কিংবা উঠানমন্দিরে আজও 'সত্যনারায়ণের পাঁচালি', 'শনিদেবের পাঁচালি', 'লক্ষ্মীর পাঁচালি' এই মতো বহু পাঁচালি সুর ও ছন্দে ঘন্টি বাজিয়ে পরিবেশন করা হয় এবং তা গীতরঙ্গসমূহের বৈঠকী রীতির কৃত্য পাঁচালির একান্ত আসর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য পাঁচালি পূর্বাপর নাট্যরূপে বিবেচ্য। কেননা 'এতে গীত ও গদ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে, সঙ্গে নৃত্য রবে পাঁচালির প্রকৃত রসনিষ্পত্তি গায়েনের অভিনয়ে। এতে গায়েন, দোহার বা পালি সহযোগে নানা চরিত্রের নিখুঁত হাবভাব ফুটিয়ে তোলেন।... ... পাঁচালি মধ্যযুগে গীতনৃত্য-নাট্যের এক দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পরীতি রূপে বিবেচ্য।'[১১]

আমাদের এখনকার সময়ে পাঁচালি আঙ্গিকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না ঘটলেও পাঁচালির মুদ্রিত পাঠ আমরা সংখ্যায় অল্প হলেও সহজে পেয়ে যাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা পাঁচালিকার দাশরথি রায় (বর্ধমান, ১৮০৬-১৮৫৭)। তিনি ছড়া ও টপ্পা এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কবিতা ও পাঁচালি রচনায় অল্প সময়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। বেশ অল্পকালের মধ্যেই দাশরথি তাঁর পাঁচালি দল নিয়ে সমগ্র বঙ্গজুড়ে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে তিনি বলিষ্ঠ পাঁচালিকার হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

বাঙলার গীতরঙ্গ ও নাট্যচর্চার ইতিহাসে দাশরথি নাম ও কৃতি অনেক গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হবে এই কারণে যে, গীত নৃত্য অভিনয় সহযোগে এই পাঁচালিই দীর্ঘকাল ধরে বাঙালির স্বতন্ত্র নাট্যরুচি তৈরি করেছে। জনতা থেকে অভিজাত, জমিদার আঙিনার বিশাল নাটমন্দির পর্যন্ত এই দাশরথির জয়জয়কার ছিল।[১২] 'দাশু রায়ের পাঁচালি' সমূহের অঙ্গসংস্থানে পাঁচালির উপাদান পদ, বোলাম, দিশা, কথা, নাচাড়ি বা অন্য কোনো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়নি। প্রতিটি পালাতে যে অনেক ঘটনা বা আখ্যানপর্ব রয়েছে তার শীর্ষভাবে এক একটি শিরোনাম যুক্ত হয়েছে। যেমন 'লব-কুশের যুদ্ধ' পালার আখ্যানপর্বসমূহ নিম্নোক্ত শিরোনামে বিন্যস্ত।

লব-কুশের যুদ্ধ
বাল্মীকির তপোবনে সীতা বর্জন
সীতার প্রতি রঘুনাথের দ্বেষ
লব-কুশের জন্ম
শ্রী রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ
হনুমান ও রাঘব ব্রাহ্মণ
অশ্বমেধ যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ
শ্রী রামচন্দ্রের নিকট নারদের আগমন
লব-কুশের যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়
শ্রীরামচন্দ্রের পতন সংবাদে সীতার বিলাপ
রণস্থলে সীতা, লবকুশ ও বাল্মীকি
বৈকুণ্ঠ ধামে রাম সীতা।

পাঁচালির মতো পুথিও এখন অতীতের বিষয়-আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। নগরে মুদ্রণব্যবস্থা চালু হওয়ার পর *জঙ্গনামা*, *সহিদে কারবালা*, *গাজী কালু চম্পাবতী*, *ভেলুয়া সুন্দরী* ইত্যাদি পুথি যে প্রচুর সংখ্যায় ছাপা হতো তা এই কিছুকাল আগের গ্রামীণ-হাটবাজারে প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রীর সঙ্গে অজিফা, আমপাড়া, খাবনামা, ছোলেমানি যাদু ইত্যাদি গ্রন্থ-পুস্তিকার মধ্যে বিশেষ আকৃতির হরফ ও যতিচিহ্নসহ হরেক পুথি সহজলভ্য ছিল। প্রকাশতারিখবিহীন চকবাজার, ঢাকা-১১০০, মোহাম্মদী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বারো টাকা মূল্যের একটি পুথি 'আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী'র পুথি। এই পুথির পাঠ বা টেক্সট কাঠামোতে এক একটি ঘটনা আখ্যান বা পর্বেও বিভিন্ন শিরোনাম যুক্ত হয়েছে। গানের ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে রাগিণী ও তালের নাম। বাঙলার গীতরঙ্গ নিবিড় পর্যবেক্ষণে বিচিত্র অঙ্গ উপাদান, পরিভাষা-শিল্পভাষার সাক্ষাৎ মেলে। একই আখ্যান গীত, লম্বাগীত, কিচ্ছা, পুথি, পালা, গীতিকা প্রভৃতি আঙ্গিক নামে বা না-নামেই যুগ যুগ ধরে গীতআমুদে মানুষের সামনে পরিবেশিত হয়ে আসছে। 'ভেলুয়াসুন্দরী' তেমনই এক বিশেষ গীতআখ্যান। নিমজ্জন পাঠরূপের গঠনশৈলীতে পাঁচালি-পুথির পর্বশিরোনামে সংযোজনরীতির সমিল ছাড়াও পুথির চরণে যুক্ত বহুমাত্রিক অর্থজ্ঞাপক তারকা চিহ্ন সরাসরি গৃহীত হয়েছে। এই তারকা যোজনার সেলিম আল দীন *নিমজ্জন* রচনার বহুপূর্বে *চাকা* পাঠরূপে যুক্ত করে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্নের ব্যবহার ছাড়াই বাক্যের সুনিশ্চিত অর্থজ্ঞাপন সম্ভব। উপরন্তু কথানাট্য রচয়িতা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, তাঁর প্রদত্ত 'চিহ্ন শাসনের পরিবর্তে নির্দেশক কিংবা অভিনেতা নিজেরাই নিজেদের সুবিধামতো বাক্যের চলনটা ঠিক করে নেবেন'[১৩] আর *নিমজ্জন* কথাপুচ্ছে আরও উল্লেখ করেন, 'বাঙলা ভাষায় বিস্ময় বা প্রশ্নবোধক চিহ্নেরও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। পরিকল্পিতভাবেই এ দুটি ভাবজ্ঞাপক চিহ্ন এ (*নিমজ্জন*) গ্রন্থে পরিত্যক্ত হলো'।[১৪]

'ভেলুয়া সুন্দরী' পুথির ঘটনা বা পর্ব শিরোনামসমূহ :

হামদ ও নাআ'ত
কেচ্ছা শুরু
আমীর সাধুর ডিঙ্গা সাজাইবার বয়ান
আমীর সাধুর সঙ্গে ভেলুয়ার সাতভাইয়ের যুদ্ধ হয় তাহার বয়ান
আমীর সাধুর সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহ হয়

ভেলুয়ার বিলাপ
ভেলুয়াকে লুটিয়া নিবার বয়ান
ভেলুয়া সুন্দরীর বারমাসী
আমীর সওদাগর কট্টালি নগরে যায় ও ভেলুয়া সুন্দরীর সহিত দেখা করে তাহার বয়ান
ভোলার সঙ্গে আমীর সাধুর যুদ্ধ।
ভেলুয়া পরীক্ষার কথা শুনিয়া আল্লাহর নিকট কান্দিয়া মোনাজাত করিবার বয়ান ও
ভেলুয়ার পরীক্ষার বয়ান
ভেলুয়াকে লইয়া আমীর সওদাগর আপন দেশে যায়[১৫]

বাঙলা পাঁচালি পুথির গড়নরীতি 'বাইবেল জাতক প্রভৃতি মহাগ্রন্থের' সঙ্গে মিলে যাবার কথা নিমজ্জন রচয়িতা উল্লেখ করেছেন।[১৬] নিমজ্জন আখ্যান প্রবাহের গোড়াতেই বাইবেলোক্ত ইউহোন্না আখ্যান বৃত্তের অর্থাৎ ২৩শ সিপারা ১ ইউহোন্না অংশে 'দজ্জাল' শিরোনামের পর্ব [১৭] থেকে 'মিলোসোভিচকে ইউহোন্নার পত্র' শীর্ষক পর্বে ১৮ ও ১৯ সংখ্যক আয়াত দুটি যুক্ত হয়েছে।

প্রথম সিপারা
মথি
হযরত ঈসা মসীহের বংশ-তলিকা
হযরত ঈসা মসীহের জন্ম
হযরত ঈসা মসীহের তালাশে পণ্ডিতেরা
হযরত ঈসা মসীহের তালাশে হেরোদ
হযরত ইয়াহ্য়িা (আ.) এর তবলিগ
হযরত ঈসা মসীহের তরিকাবন্দী
হযরত ঈসা মসীহকে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা
হযরত ঈসা মসীহের কাজের শুরু
সাহাবী গ্রহণ
অনেকে সুস্থ হল
পাহাড়ের উপর শিক্ষাদান
... ... ইত্যাদি

আখ্যান গড়নের প্রাচীন সূত্রাদির পর এখন আধুনিক 'উত্তরাধুনিক' সময়ের টেক্সট বা পাঠরূপের পাঠবিন্যাস থেকে সংক্ষেপে দুটি নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে। জার্মান নাট্যবিদ হাইনের ম্যুলার (জার্মানি, ১৯২৯-১৯৯৫) নাটকের পাঠ ও প্রয়োগগত যাবতীয় রীতি-প্রথাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে রচিত *হ্যামলেট মেশিন* (১৯৭৯) 'উত্তরাধুনিক' সারণিভুক্ত একটি নাটক। এক পৃষ্ঠার ফুটনোটসহ মোট আট-নয় পৃষ্ঠার এই পাঠরূপটিতে আলাদা শীর্ষনামসহ পাঁচটি পর্ব রয়েছে। নিরীক্ষাধর্মী এই নাটলিপি মূলে জার্মান ভাষায় হলেও নাট্যকার এতে প্রচুর সংখ্যক ইংরেজি শব্দ, বাক্য, উদ্ধৃতি, বাগধারা এবং বাক্প্রতিমা যুক্ত করেছেন। যেভাবে বিন্যস্ত (Dennis Redmond-এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে):

1. Family Album
2. The Europe of the Woman
   Enormous room. Ophelia. Her heart is a clock.
3. Scherzo

University of the Dead. Whispers and murmurs. From their gravestones (cathedrals) dead philosophers throw their books at Hamlet...

4. Pest in Buda battle of Greenland
5. Wildstrainint / In the Fearsome Armaments / Millenia

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'রবীন্দ্র' 'আধুনিক' ইত্যাদি যুদ্ধপরবর্তীকালে কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫), দেবেশ রায় (১৯৩৬–২০২০), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), সুবিমল মিশ্র (১৯৪৩) প্রমুখ একালের আখ্যানকার কিংবা কথকগণ আখ্যান রচনার উপনিবেশি প্রভাব জনপ্রিয় বলয়ের অনুবর্তী না হয়ে স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় নির্মাণ করেছেন এক একটি পাঠ। এসবের মধ্য থেকে আলোচ্য পাঠ (*নিমজ্জন*) বিশ্লেষণের সহায়ক অধ্যয়নসূত্রাদি বিবেচনায় এ পর্যায়ে দেবেশ রায় প্রণীত *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮) থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার এই বৃত্তান্তে আদিপর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, বৃক্ষপর্ব, মিছিলপর্ব, অন্তপর্ব নামাঙ্কনের সঙ্গে আলাদা পর্বনামও রয়েছে। পর্যায়ক্রমে পর্বনামসমূহ : গয়ানাথের জোতজমি, বাঘারুর নির্বাসন, নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্তবাহিনীর সীমান্তত্যাগ, বাঘারুর প্রত্যাবর্তন, উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র প্রভৃতি। প্রতিটি পর্বে আবার স্বতন্ত্র শিরোনামসহ অনেক উপপর্ব। যেমন–

আদিপর্ব
গয়ানাথের জোতজমি
এক হাটের পথে
দুই ন্যাওড়া নদীর খেয়া
তিন 'সত্যমের জয়তে'
চার ঢোলের বদলে মাইক
পাঁচ প্রিয়নাথের সাহেব ও হাটকমিটি ... ...[১৮]

বিশ্লেষণের জন্য *নিমজ্জন*-এর তিনটি পাঠ আমাদের সামনে রয়েছে। গ্রন্থরূপে যে পাঠ (বইমেলা, ২০০৪) *নিমজ্জন*-এর চূড়ান্ত প্রকাশরূপে গৃহীত, সে পাঠের পূর্বে আরও একটি মুদ্রিত পাঠ (বইমেলা, ২০০৩) যা মুদ্রণপ্রমাদসহ আরও কিছু বিচ্যুতির কারণে বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া হাতেলেখা পর্যায়ে সমগ্র পাঠটি 'অন্তত তিনবার' পুনর্লিখনের পর প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপি। বিশ্লেষণের জন্য চূড়ান্ত 'মুদ্রিত পাঠই বিবেচ্য' তবু যে বদল বিবর্তনের মধ্য দিয়ে *নিমজ্জন*-এর গড়ন কাঠামো চূড়ান্তরূপ পেয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্তসহ চূড়ান্ত মুদ্রিত (বইমেলা, ২০০৪) পাঠকে ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচনাশৈলির স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা তুলে ধরা

উপর্যুক্ত তিনটি টেক্সটের ভিতরকার পাঠভেদ বা পাঠান্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিতে ১* মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু এবং এখানে মোট পর্বসংখ্যা ১৭৪। প্রথম মুদ্রিত ও বাতিলকৃত পাঠে পর্ব রয়েছে ১৯২টি। চূড়ান্ত সংস্করণে 'মঙ্গলাচরণ'-এর আগে 'সূচনাগীত' যুক্তসহ পর্ব ও পর্বনাম বদল ও সংযোজন শেষে পর্বসংখ্যা স্থির হয়েছে ১৯৩। মুদ্রিত দুটি টেক্সট্-এ মঙ্গলাচরণ শুরু হয়েছে একই বাক্প্রতিমা– 'এক রুক্ষবর্ণ স্টিমার এসে বন্দরে থামে...' দিয়ে। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে বোঝা যাবে 'রুক্ষবর্ণ' শব্দটি গ্রন্থপ্রকাশকালে যুক্ত হয়েছে; সেস্থলে শব্দ ছিল 'হত্যাকারী'। সহজ ও সুনির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক 'হত্যাকারী' শব্দের বদলে

আমাদের পঠনবিশ্ব থেকে অন্তর্হিত, এমনকি অভিধানেও সহজে মেলে না এমন 'রুক্ষবর্ণ' শব্দটি কেবল চূড়ান্ত পাঠে যুক্ত হয়েছে তা নয়, এর পেছনে লেখকের সৃজন জগতের বীজতলার শিল্প গড়নের অর্থাৎ *নিমজ্জন* গড়ে উঠবার 'পূর্বকথন' সংবাদ রয়েছে। *নিমজ্জন*'-এর 'কথাপুচ্ছ'র গোড়াতেই বীজতলার শিল্প গড়নের অর্থাৎ *নিমজ্জন* গড়ে উঠবার 'পূর্বকথন' সংবাদ রয়েছে। *নিমজ্জন*-এর 'কথাপুচ্ছ'র গোড়াতেই তিনি তা উল্লেখ করেছেন : 'কাব্যতীর্থ অনুসন্ধানব্রতী একজন কবির দূরযাত্রা বিষয় ও রবীন্দ্রতীর্থে বিফলগমন * পথান্তর ও মৃত্যু নিয়ে রুক্ষবর্ণ শীর্ষনামে একটি কাব্য লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলাম। ... ভেবেছিলাম ঐ কাব্যের পর হয়তো লেখা থেকেই অবসর নেব। তা হয়নি। বরং সে স্থলে এস দাঁড়াল নতুন লেখা *নিমজ্জন* ।[১৯] সেলিম আলম দীন রচনাসম্ভারে চোখ রাখলে দেখা যাবে– বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত আখ্যান বা আখ্যাননাট্য তিনটি–দুটি গ্রন্থাকারে (যেমন, *চাকা-যৈবতীকন্যার মন- হরগজ। বনপাংশুল-প্রাচ্য)* একই রকম আঙ্গিকের সমীপবর্তী থেকেছে। সেদিক থেকে দেখা যাবে ইত্যাকার সকল আঙ্গিকগত অভিজ্ঞতা *নিমজ্জন*-এ এসে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

নিমজ্জন-এর সমগ্র পাঠজুড়ে 'রুক্ষবর্ণ' মতো সাধারণ পাঠ-পঠন অভিজ্ঞতায় দূরবর্তী অনেক শব্দ ও বাকপ্রতিমা রয়েছে, যা *নিমজ্জন* প্রয়োগ বিশ্লেষণে গিয়ে দেখার সুযোগ পাবো যে, যেসব শব্দ ও বাকপ্রতিমাসমূহের উপস্থাপন-পরিবেশন কিংবা পারফরমেন্স-পরিণতি কী রূপ পায়। এইসঙ্গে এ প্রশ্নও আগাম উল্লেখ করা যায় যে, *নিমজ্জন* সমগ্র পাঠরূপটিকে কি একক নাটলিপিরূপে বিবেচনা করব, না কি এর মধ্য থেকে পারফরমেন্স সংক্রান্ত ভিন্ন কোনো বিবেচনায় পৌঁছে যাব।

রচনা কাঠামোর স্বাতন্ত্র্যের কারণেই পাঠ-বিশ্লেষণের প্রচলিত পদ্ধতি দ্বারা *নিমজ্জন*-এর পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। পাঁচালি কথকতার গায়েন কথক প্রমুখ কথা-গীত-সুর-ছন্দে যেভাবে আখ্যান পরিবেশন করেন এখানেও নাগরিক কথক বা কথকবৃন্দ 'বর্তমান সঙ্কটসঙ্কুল বিশ্বকে' প্রধানত বর্ণনাভাষ্য ও কিয়ৎ কথাক্রিয়া বা সংলাপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন।

নিমজ্জন আখ্যান-কাঠামো বিশ্লেষণের জন্য আর একটি পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাহলো, এই অন্তর্কাঠামো জুড়ে অস্তিমান রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। *নিমজ্জন* গ্রন্থটি 'রবীন্দ্রমহাস্মৃতির উদ্দেশ্যে' উৎসর্গের ইচ্ছা এবং সে সম্পর্কে দ্বিধাসঙ্কুল 'মর্মবেদনা' প্রকাশিত রয়েছে উৎসর্গবিহীন প্রথম গ্রন্থরূপটির কথাপুচ্ছ অংশে (প্রাগুক্ত : ১৯০)।[২০] অবশ্য শেষাবধি চূড়ান্ত গ্রন্থরূপের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ থাকছে–'রবীন্দ্রমহাভুবনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত'। এছাড়া এই আখ্যান কাঠামোর অন্তর্গত; অন্তত আরও দুই অনুষঙ্গে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ দুইভাবেই রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে। একদিকে, কথক এবং আখ্যানোক্ত চরিত্রাবলির বয়ানে স্পষ্টতই রবীন্দ্রনামকৃতি ও চিন্তার কথা বারংবার উক্ত হয়েছে, নানা পর্বে। আবার অন্যদিকে, আখ্যানের প্রায় আদ্যান্তজুড়ে বর্ণনা, কথা, গান ইত্যাদি রচনায় কখনও সরাসরি রবীন্দ্রবাণীর গ্রহণ, আবার কখনও রবীন্দ্রবাণীর আলোয় উদ্ভাসিত বর্ণনা কথা ও গানের নবতর বয়ান।

নিমজ্জন আখ্যানোক্ত কথাক্রিয়াদির স্থান বা দেশকাল সম্পর্কে পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। বরং এ প্রসঙ্গে কথাপুচ্ছে স্পষ্ট উল্লেখ : '*নিমজ্জন* বিশেষ কোনো একটি দেশ বা নগরকে নির্দিষ্ট করে রচিত নয়'। আর বর্তমান সঙ্কটসঙ্কুল বিশ্বকেই এ আখ্যানে নগররূপে দেখতে পাওয়া হয়েছে। তদুপরি, আখ্যানটির সর্বাংশে বর্ণনা ও কথার সূত্র চিরায়ত বাঙলার নানা চিহ্নসূত্রসহ (ভাদ্রভোর, ভাদ্রদিনের পূর্ণপ্রাত, ভাদ্রের দুপুর, ভাদ্ররাত্রি, অধভাদ্ররাত্র, ভাদ্রের রোদ, ভাদ্রের আকাশ, ভাদ্রের

গরম, ভাদ্রবাতাস) পৌনপুনিক প্রয়োগের কারণে এ আখ্যানকে (স্থান, কাল ও প্রসঙ্গসমেত) নন্দনজাত স্বতন্ত্র নির্মাণরূপেই চিহ্নিত করা সম্ভব।

পাঠবিশ্লেষণের লক্ষ্যে সমগ্র পাঠরূপটির পর্বসমূহের বর্ণিত প্রসঙ্গ, স্থানকাল ও কথা বা নাট্যক্রিয়া সাপেক্ষে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে সমগ্র *নিমজ্জন* তার দীর্ঘ ঘটনা কিংবা টেক্সটবহুল পর্বসমূহ থেকে কথক ও কথকের বর্ণনায় উন্মোচিত চরিত্র ঘটনা ও ক্রিয়াবলিকে সংক্ষিপ্ত অবলোকনে পাওয়া সম্ভব।

এ পর্যায়ে *নিমজ্জন* আখ্যানসমগ্রের গঠনকাঠামোর স্বরূপ সংক্ষিপ্ত বয়ানে ও রেখাচিত্রসহযোগে উপস্থাপন করা যেতে পারে। *নিমজ্জন* পাঠরূপে আখ্যানের কথাক্রিয়াসূত্রে যত প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ এবং পরোক্ষা প্রত্যক্ষভাবে যত মানুষ এখানে বর্ণিত হয়, তাতে এই পাঠরূপের আঙ্গিক পরিচিতি কেবল কাব্য, নাটক কিংবা আখ্যান কোনো এক নামে ভুক্ত করা যত কঠিন তার চেয়ে অনেক সহজ একে না-কাব্য, না-নাটক বা না-আখ্যান ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করা।

রচয়িতা স্বয়ং একে কাব্য নামে অভিহিত করলেও *নিমজ্জন*-এর পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন রচয়িতার মূল অভিমুখিতা নাটক ও নাট্যের দিকেই। আর এ কারণেই গবেষক, শিক্ষার্থী কিংবা প্রযোজনাকর্মী যেকোনো ক্ষেত্রের প্রয়োজনেই প্রথম প্রশ্ন আসে–একশ তিরানব্বই পর্বে বিন্যস্ত বর্তমান পাঠরূপকে কি *নিমজ্জন* নাট্যের নাটলিপি বা পাণ্ডুলিপি বলে বিবেচনা করব? তাহলে তা কি একক কোনো প্রযোজনার নাটলিপি না কি বহু প্রযোজনার নাটলিপি? এসবের উত্তর মেলাবার আগে উল্লেখ প্রয়োজন যে, আমাদের নগরনাট্য অভিজ্ঞতায়, প্রাচীন থেকে একাল অবধি, নাট্য প্রযোজনার নাটলিপি অর্থাৎ নাটক/পাণ্ডুলিপি আকার-আয়তন বা আখ্যান সমাবেশ সবই (প্রযোজনার সময় সাপেক্ষ) পরিমিত ও সংহতরূপে দেখতে অভ্যস্ত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শিল্পরীতি প্রবর্তনার মধ্য দিয়ে বাঙলার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট নাট্যনির্মাণের যে চিন্তা ও রসদ তা লেখক আহরণ করেছেন দেশজ বা নিজস্ব গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য অর্থাৎ বাঙলার গীতরঙ্গের আসর আয়োজন থেকে। সেখানে সাধারণত নগরসংস্কৃতির ধাঁচে দেড় দুঘণ্টা সময়ের মাপে এবং একক কোনো আঙ্গিকনামে (যেমন নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি) পরিবেশিত হয় না। গীতরঙ্গের আসরে কুশান গান, অষ্টক গান কিংবা রয়ানি গান ইত্যাদি 'গান' আঙ্গিকনামে অভ্যস্ত দর্শক শ্রোতা এসব থেকে অর্থাৎ রামায়ণের আখ্যান (কুশান গান), শিব-পার্বতী বা রাধাকৃষ্ণের আখ্যান (অষ্টক গান) বা মনসামঙ্গল পদ্মপুরাণের আখ্যান-এর বিশাল আয়তন থেকে খুব সামান্যই এক এক আসরে পেয়ে থাকেন। বাঙলার গীতরঙ্গ চর্চার মুক্ত আঙ্গিক বা মুক্ত আসর ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে *নিমজ্জন* পাঠ ও প্রযোজনা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ঐতিহ্যের আঙ্গিকসূত্র অনুযায়ী এ অভিমত রাখা যেতে পারে যে, *নিমজ্জন* প্রযোজনাতে (তা শ্রুতি দৃশ্য চিত্র চলচ্চিত্র যেকোনো মাধ্যমেই হোক) সমগ্র পাঠ বা আখ্যানকাঠামোর অংশত সেখানে পরিবেশিত বা প্রদর্শিত হবে।

নিমজ্জন-এর আখ্যানকাঠামো প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে এর 'গল্পহীনতা' বা 'গল্পহীন গল্পে'র কথা বলা হয়েছে।[২১] কিন্তু আমাদের *নিমজ্জন* ব্যবচ্ছেদ তথা বিশ্লেষণে মহাআয়তনের এই পাঠরূপেও সুনির্দিষ্ট গল্পকাঠামোর সাক্ষাৎ পেয়ে যাবো। যেমন এক ঝলকেই দেখে নেওয়া সম্ভব যে, দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বভূগোল মানচিত্রে পর্যটনকারী 'আগন্তুক' তার বহুকাল না দেখা বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে যে যে দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছেন এবং যে যে দৃশ্যস্মৃতি মনে জড়ো বা বর্ণিত বা উপস্থাপিত হয়েছে সেসবের এক নান্দনিক বিন্যাস অর্থাৎ কম্পোজিশনের নাম নিমজ্জন।

এখানে লক্ষণীয়, আগন্তুক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে তিন নদীর মোহনায় একাকি দাঁড়িয়ে এবং পরবর্তী কিছু সময় অন্তর বাস্তব কিংবা পরাবাস্তব দৃশ্যাবলির ভিতর দিয়ে বন্ধুর শহরে প্রবেশ, এবং তিন চারদিন পর ধ্বস্ত ও শূন্য শহর থেকে বেরিয়ে নতুন কোনো ধরিত্রীপানে এগিয়ে যাওয়ার আখ্যানে যত প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ বর্ণিত হয়েছে তার বেশিরভাগ প্রসঙ্গ আগন্তুকের অভিজ্ঞতালব্ধ ও অনুভূতিজাত। আর অল্পকিছু পর্বে ব্যক্ত হয়েছে বন্ধুর শহরের অদ্ভুত সব ঘটনা বা দৃশ্য।

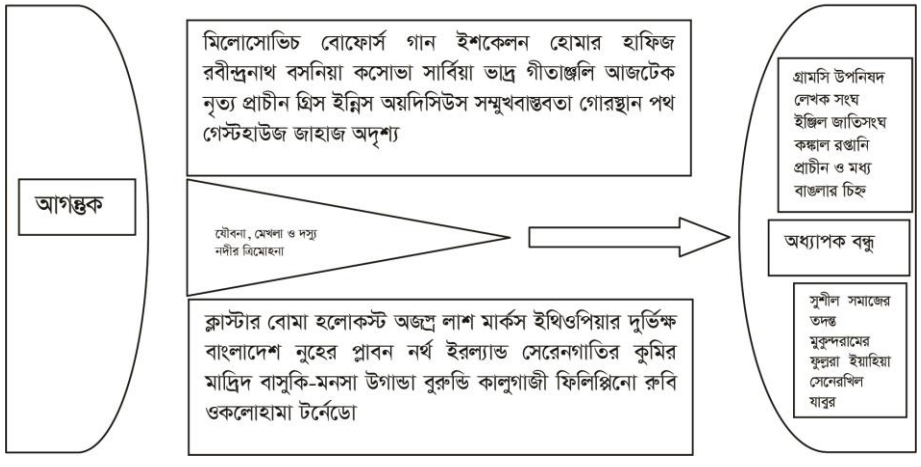

নিমজ্জন আখ্যানের কথা-ক্রিয়ার প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ

সমগ্র আখ্যানজুড়ে অজস্র ঘটনায় অসংখ্য মানুষের উল্লেখ রয়েছে। তবে আখ্যানের কথা-ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ চরিত্র বা মানুষ কিন্তু মাত্র কয়েকজন। আগন্তুক, অধ্যাপক ছাড়া পর্যায়ক্রমে যাদের সক্রিয় উপস্থিতি পাই– কাঠের পাঅলা ভিখারি, গেস্ট হাউজের মালিক, প্রশান্ত যুবক, অদ্ভুত দর্শন রিকশাঅলা, নার্স মেয়েটি, অধ্যাপকের শিষ্য ছাত্রটি, সাহিত্যের অধ্যাপক, ছোট্ট মেয়েটি এবং প্রৌঢ়প্রায় কবিসহ আর দু'একজন।

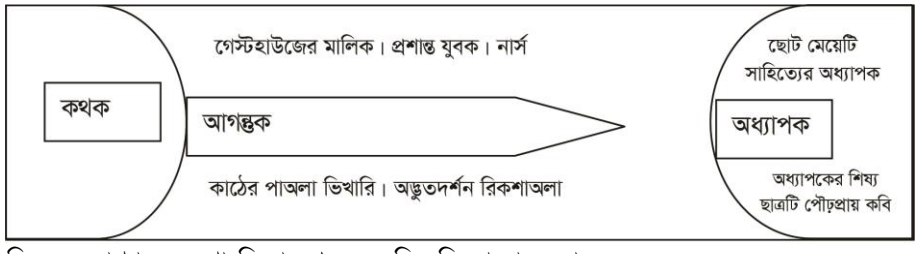

নিমজ্জন আখ্যানের কথা-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ চরিত্র কিংবা মানুষেরা

নিমজ্জন সমগ্র আখ্যানের বর্ণনা বা সংলাপে কোথাও ঘটনা ও চরিত্রসমূহের দেশকাল বা সুনির্দিষ্ট পরিচয় নির্ণীত হয়নি। বরং আখ্যানোক্ত নাম, শব্দ এমনকি কোনো কোনো প্রসঙ্গ নির্বাচনে সচেতনভাবে পরিচয়নিরপেক্ষ (যেমন, 'অমুক', 'তমুক') শব্দপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও পর্বের পর পর্বে অজস্র অনুষঙ্গ উক্ত হলেও সমগ্র পাঠে কয়েকটি চাবিশব্দ আমরা পেয়ে

যাই। যার মধ্য দিয়ে পাঠক দর্শক শ্রোতা আখ্যানের কথক ও ঘটনায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ চরিত্র বা মানুষগুলোর দেশকাল পরিচয় সম্পর্কে ধারণা কিংবা আভাষ পেয়ে যেতে পারেন। যদিও তা কখনো স্থানিক পরিচয়রূপে আভাষিত হয়েও পরক্ষণে অস্থানিক বা সর্বস্থানিকরূপে বর্ণিত হয়েছে। 'ভাদ্র' 'রবীন্দ্রনাথ' 'গীতাঞ্জলি' 'বাংলাদেশ'– বাংলা ও বাঙালির স্বতন্ত্র ও বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ বা প্রসঙ্গ এ আখ্যানের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। এছাড়া 'ভাদ্র', রবীন্দ্রনাথ' 'গীতাঞ্জলি'র মতো পৌনপুনিক প্রয়োগে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নতুন এক শব্দপ্রতিমা–'সম্মুখবাস্তবতা'।

সেলিম আল দীন *নিমজ্জন* রচনাপর্বে এর আখ্যানবীজ থেকে রচনা, পুনঃরচনা, প্রকাশ, পুনর্প্রকাশ এবং মঞ্চায়ন অবধি নানারকম অনুভূতি, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন 'কথাপুচ্ছ'সহ আরও দুএকটি রচনা ও আলাপনে। 'রবীন্দ্র মহাস্মৃতির উদ্দেশ্যে' উৎসর্গের ইচ্ছা (তখন পর্যন্ত) অপূর্ণ থাকায় কথাপুচ্ছে উল্লেখ করেছিলেন: 'ভগ্নসাহস শেষঅবধি তাঁর চরণপ্রান্তে পৌঁছাল এই মর্মবেদনা একদিন সফল তো হবে।'[২২] তিনি এই অভিমত রেখেছেন যে, পৃথিবীর মহৎ লেখকগণ তাদের পূর্ববর্তীকলের সকল ভাবসম্পদ আহরণপূর্বক নিজেকে বর্তমান ও পরবর্তীকালের জন্য অনিবার্য করে তোলেন এবং একইসঙ্গে স্বয়ম্ভু বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠেন। মানবের সকল ভাবসম্পদের অনিবার্য সেতুরূপে একই পঙক্তিতে তিনি উল্লেখ করেছেন ভার্জিল, গ্যেটে, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নাম।[২৩]

সেলিম আল দীনের এক একটি নাটক রচনা সমকালীন নাট্য ধারণার বিপরীতে এবং বিষয় আঙ্গিকের অভিনবত্বে বাঙলা নাট্যসম্ভারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। *নিমজ্জন* পাঠরূপ ও পাঠরূপের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রবীক্ষার সন্নিহিতকরণ এ আখ্যানকে বিশিষ্ট মাত্রায় উন্নীত করেছে। ইতিহাসের আলোকে এ অভিমত রাখা সম্ভব যে, শিল্প সাহিত্যে প্রচলবিরোধী সৃজন সমকালে সবটা বোঝাপড়া না হলেও ভবিষ্যতের শ্রোতা দর্শকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগে সম্পূর্ণতা পেয়ে যায়। *নিমজ্জন*কে তেমন এক টেক্সট বা পাঠরূপ বলে গণ্য করা সম্ভব।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সেলিম আল দীন প্রণীত চাকা (১৯৯১) পাঠরূপের 'গ্রন্থমুখ'-এ কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক 'নতুন সাহিত্য মাধ্যম আবিষ্কার' কথানাট্যকে এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

২. *নিমজ্জন* পাঠরূপের অন্তিম চরণ–'ইতি সেলিম আল দীনকৃত নিমজ্জন নাম কাব্য'। কথানাট্য ধারার পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে এর আঙ্গিক নাম 'কাব্য' অভিহিতকরণ তাৎপর্যের সঙ্গে বিবেচনা করা সম্ভব।

৩. সেলিম আল দীন, *নিমজ্জন* (ঢাকা: ক্রান্তিক, ২০০৩), পৃ. ১৮৮

৪. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ৭৯

৫. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৫* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ৫২৪

৬. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ* (ঢাকা: শিক্ষাসংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৮), পৃ. ২০২

৭. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৫* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ৫২৪

৮. ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিশেষত হাওর জনপদে গীত লম্বাগীতের মূল গায়েনকে গীতালু বলা হতো। এখন এই নাম প্রায় বিলুপ্ত বলা চলে।

৯. সেলিম আল দীন, *নিমজ্জন* (ঢাকা: ক্রান্তিক, ২০০৩), পৃ. ১৮৮

১০. *তদেব*

১১. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ* (ঢাকা: শিক্ষাসংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৮), পৃ. ২১৫

১২. অর্ধেন্দুশখর রায়, ড. *দাশরথি রায়ের পাঁচালি* (কলিকাতা: মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থা ১৯৯৭), পৃ. IX

১৩. সেলিম আল দীন, *চাকা* (ঢাকা: গ্রন্থিক ১৯৯১), পৃ. ৪৫

১৪. সেলিম আল দীন, *নিমজ্জন* (ঢাকা: ক্রান্তিক, ২০০৩), পৃ. ১৯০

১৫. অর্ধেন্দুশখর রায়, ড., *দাশরথি রায়ের পাঁচালি* (কলিকাতা: মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থা), পৃ. IX

১৬. সেলিম আল দীন, *নিমজ্জন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

১৭. *ইঞ্জিল শরীফ* (ঢাকা: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ২০০৭), পৃ. ৮৩২

১৮. দেবেশ রায়, ১৯৮৮ *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, চতুর্দশ সংস্করণ, ২০০৮, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮

১৯. সেলিম আল দীন, *নিমজ্জন* (ঢাকা: ক্রান্তিক ২০০৩), পৃ. ১৮৮

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

২১. সেলিম আল দীন এবং তাঁর নাট্যকৃতির বিভিন্ন আলোচনায় নিমজ্জনের এই 'গল্পহীনতা' প্রসঙ্গ নানাভাবে উঠে এসেছে।

২২. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০

২৩. *তদেব*